IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

নামকরণ -"ভাগের রেখায় জীবন: ১৯৪৭-এর অভিজ্ঞতায় মানুষের আত্মকথন"

(Title-'Bhager Rekhay Jibon : 1947 r Abhigotyay Manusher Atmakathan')

অনুকূল বিশ্বাস (Anukul Biswas),
শিক্ষক ও লেখক (Teacher & Writer)
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদহ
(Ramakrishna Mission Vivekananda Vidyamandir, Malda)
আর. কে. মিশন রোড (R. K. Mission Road),
জেলা : মালদহ (Malda)। পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal), ভারত (India)।
স্বাধীন গবেষক (Independent Researcher)

সার সংক্ষেপ (Abstract) :
"ভাগের রেখায় জীবন: ১৯৪৭-এর অভিজ্ঞতায় মানুষের আত্মকথন" শিরোনামের এই গবেষণা ১৯৪৭ সালের দেশভাগ-কে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক ঘটনা হিসেবে নয়, একাধিক জীবনের শিকড়ছেঁড়া অভিজ্ঞতা, মানসিক বিপর্যয় ও সাংস্কৃতিক অবসানের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে। মালদা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম রাঙামাটিয়া এবং তার সংলগ্ন খুটাদহ, বটতলী, নন্দিনাদহ, তালতলা, হরিপাল ও সোনঘাট—এই সমস্ত জনপদ পূণর্ভবা নদীর এক পাড়ে অবস্থিত, যার অপর পাড়েই সেই সময় জন্ম নিয়েছিল এক নতুন দেশ—পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ। নদীটি যেন এখানে নিছক একটি প্রাকৃতিক উপাদান নয়, বরং এক জীবন্ত ইতিহাসবাহী বিভাজনরেখা, যা দুটি ভূখণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষের জীবনে রেখে গেছে গভীর ক্ষতের দাগ।সেই সঙ্গে দুপাড়ের শতশত মানুষের জীবিকা নির্বাহের ধারক ও বাহক।

এই গবেষণায় আমরা আত্মকথনের আলোকে বিশ্লেষণ করেছি, কীভাবে এই অঞ্চলগুলির মানুষ দেশভাগের অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। যে নদী এক সময় প্রাণের সঞ্চার করত, সেই নদী-ই হয়ে উঠেছে বিচ্ছেদের প্রতীক—যার জলরেখায় ধরা পড়ে কান্না, উৎকণ্ঠা ও শূন্যতার স্পন্দন। দক্ষিণে নন্দিনাদহ ও উত্তরে খুটাদহ—রাঙামাটিয়ার এই ভৌগোলিক অবস্থান নিজেই এক মানসিক সীমানা চিহ্নিত করে, যেখানে ইতিহাস আর ভূগোল একে অপরকে নির্দিষ্ট করে। এই গবেষণাপত্র আত্মজৈবনিক তথ্য, মৌখিক ইতিহাস এবং স্মৃতিকথার সাহায্যে তুলে আনে সেইসব মানুষের কণ্ঠস্বর, যাঁদের কথা ইতিহাসের মূলধারার নথিতে খুব কমই ঠাঁই পেয়েছে।

যারা ওপার থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে এসেছে এপারে, তাঁরা হারিয়েছেন কেবল বসতভিটে নয়, হারিয়েছে ভাষা, সংস্কৃতি, পরিচিতি এবং আত্মপরিচয়ের বোধ। আবার যাঁরা ছিল এই পাড়ে, তাঁদের জীবনেও অনুপ্রবেশ করেছে সন্দেহ, অস্থিরতা ও এক অজানা ভয়। দিনের আলো ফুরিয়ে সন্ধ্যে নেমে আসলে সেই ভয় পরিণত হতো আতঙ্কে।নিরীহ অসহায় নিঃস্ব মানুষ গুলোর দৈনন্দিন জীবনে ভয় ও আতঙ্কের ছায়া ছিল চিরসঙ্গী। রাতের আতঙ্কের অন্যতম কারণ ছিল--- একদিকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চোখ রাঙানি, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের লাগামছাড়া লুটতরাজের সীমাহীন অত্যাচার।

এই আত্মকথনসমূহ কেবল ব্যক্তিগত স্মৃতি নয়, বরং এক গভীর সামাজিক দলিল—যা দেখায় কী ভাবে বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্তি-মানুষের জীবনে ছাপ ফেলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। গবেষণার প্রয়াস এটাই—যে ইতিহাস কেবল শাসকের কলমে রচিত নয়, বরং সাধারণ মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত, বেদনার সঙ্গে গঠিত, রক্ত ও চোখের জলের সঙ্গে মিশে গড়ে ওঠা। এই স্মৃতিরেখাগুলিই আমাদের সামনে তুলে ধরে এক এমন ইতিহাস, যা মানবিকতা, সংবেদনশীলতা ও সাহচর্যের আলোয় পাঠ করা সম্ভব।

মুখ্যশব্দ (Key Words) :
দেশভাগ, আত্মকথন, মালদহ, রাঙামাটিয়া, পূণর্ভবা নদী, স্মৃতি, গ্রামীণ সমাজ, উদ্বাস্তু, মানসচিত্র, মৌখিক ইতিহাস

ভূমিকা (Introduction):

ইতিহাস শুধু সময়ের রেখায় ঘটনাপুঞ্জের ধারাবাহিক নথিপত্র নয়—তা মানুষের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও অনুভূতিরও নিঃশব্দ স্বাক্ষর। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ইতিহাসে এক রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক পরিবর্তনের সূচক হলেও, উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে তার অভিঘাত ছিল গভীরভাবে ব্যক্তিগত, যন্ত্রণাময় এবং বহুস্তরীয়। দেশভাগ মানেই যেন রাষ্ট্রের মানচিত্রে নতুন রেখার টানা; কিন্তু সেই রেখার টানে ছিন্নভিন্ন হয়েছে অসংখ্য সংসার, শিকড়হারা হয়েছে মানুষ, বদলে গেছে পরিচয়, এবং গঠিত হয়েছে এমন এক মানসিক ভূগোল—যার প্রতিফলন ঘটে তাঁদের আত্মকথনে, যাঁদের কথা ইতিহাসে খুব কমই ধরা পড়ে।

এই গবেষণাপত্র “ভাগের রেখায় জীবন: ১৯৪৭-এর অভিজ্ঞতায় মানুষের আত্মকথন” মূলত মালদহ জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম রাঙামাটিয়া এবং তার আশেপাশের খুটাদহ, বটতলী, নন্দিনাদহ, তালতলা, হরিপাল ও সোনঘাটের মানুষের দেশভাগ-পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা ও মানসিক অভিঘাতকে বিশ্লেষণ করতে চায়। এই অঞ্চলের বিস্তার পূণর্ভবা নদীর তীরে, যা বিভাজনের সময় এক নতুন সীমানার প্রতীক হয়ে ওঠে—নদীটি হয়ে দাঁড়ায় ভূখণ্ডগত নয়, বরং মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিভেদের প্রতীকরূপে। এ যেন এক জীবন্ত রেখা, যা দুই দেশকে আলাদা করলেও, তার দুই পারের মানুষদের যন্ত্রণাকে এক সুতোয় গেঁথে রাখে।

দেশভাগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন, সাংস্কৃতিক স্মৃতি, স্থানচ্যুতি এবং মানসিক বিপর্যয়—এসবের আলোচনায় বাংলার পশ্চিম সীমান্ত, বিশেষ করে মালদহের এই অঞ্চল প্রায়ই ইতিহাসের মূল আলোচনার বাইরে থেকেছে। পাঞ্জাবের তুলনায় বাংলায় দেশভাগের চেহারা ছিল দীর্ঘমেয়াদী ও ধীরে ধীরে বিস্তার লাভকারী, যার অভিঘাত যুগ পেরিয়েও বর্তমান প্রজন্মের মানসিক চেতনায় রয়ে গেছে। এই গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণের প্রয়াস, যেখানে ‘ঐতিহাসিক তথ্য’ নয়, বরং ‘মানুষের বয়ান’—অর্থাৎ আত্মজৈবনিক উপাদান, মৌখিক ইতিহাস ও স্মৃতিকথা হয়ে ওঠে মূল বিশ্লেষণাত্মক উপকরণ।

এই অঞ্চলের মানুষের বয়ানে ধরা পড়ে কিভাবে তাঁদের জীবনের পরিচিত ভূগোল, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামাজিক অবকাঠামো এক মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল। পূর্ণর্ভবার পাড়ে বসে যাঁরা একদিন পূর্ব পাকিস্তানকে দূরের কল্পনা ভাবত, তাঁরাই একদিন অনুভব করল সেই অপর পাড়টাই তাঁদের অচেনা হয়ে গেছে। যাঁরা এপার বাংলায় বসবাস করছিল, তাঁদের জীবনে ঢুকে পড়ল সন্দেহ, অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি। আবার যাঁরা ওপার থেকে এসেছিল, তাঁদের জীবন ছিল অনিশ্চয়তা, হিংসা, আতঙ্ক এবং সর্বস্ব হারানোর বেদনার গল্পে ভরা। এইসব গল্প একদিকে যেমন রাজনৈতিক ইতিহাসকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে, তেমনি মানুষের মানসিক জগত, সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে উপলব্ধি করতেও সহায়ক।

এই গবেষণার একটি মূল লক্ষ্য হল ঐতিহাসিক ঘটনাকে 'অভিজ্ঞতার ইতিহাস' রূপে দেখা—যেখানে প্রধান চরিত্র রাষ্ট্র নয়, বরং সাধারণ মানুষ। এই ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে তাঁদের স্মৃতি, যন্ত্রণার ভাষা, এবং হারানো পৃথিবীর ছায়া। যে ভাষা দিয়ে তাঁরা সেই অতীতকে মনে রাখে, তা কখনও কবিতায়, কখনও কথায়, কখনও চোখের জল বা দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশ পায়। স্মৃতি এখানে শুধুমাত্র রোমান্টিক পুনর্গঠন নয়, বরং এক ধরনের প্রতিরোধ—একটি প্রচেষ্টা, যা সময়ের বিস্মৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অস্তিত্বের সাক্ষ্য রেখে যায়।

এই কাজের মধ্যে দিয়ে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে—দেশভাগ কি কেবল একটি এককালীন ঘটনা, নাকি একটি চলমান প্রক্রিয়া? মালদহের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর অভিজ্ঞতা এই ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করে। এখানে দেশভাগ মানে শুধু ১৯৪৭-এর আগস্ট মাস নয়; বরং তা এক দীর্ঘস্থায়ী অভিজ্ঞতা, যার অভিঘাত প্রজন্মের পর প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এই গবেষণাপত্র ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ না করে, বরং তার অভিঘাতকে অনুভব করার একটি রাস্তা নির্মাণ করে।

এই গবেষণা আত্মকথনের মাধ্যমে ইতিহাসের এক বিকল্প পাঠ নির্মাণের প্রচেষ্টা—যেখানে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতা নয়, বরং তার পরিপূরক হয়ে উঠে সাধারণ মানুষের গল্প। ইতিহাস যেখানে পরিসংখ্যান আর রাজনৈতিক বক্তৃতার দখলে, সেখানে এই আত্মজৈবনিক দলিলগুলি স্মৃতি, মানসিকতা ও অভিজ্ঞতার গভীরতর পাঠ তুলে ধরে। রাঙামাটিয়া ও তার আশেপাশের জনপদের মানুষজনের জীবন এই আলোচনায় হয়ে ওঠে এক প্রতিবিম্ব—যেখানে দেখা যায় কীভাবে ভৌগোলিক রেখার টান মানুষের জীবনে তৈরি করে সংস্কৃতিগত, আত্মপরিচয়গত এবং মানসিক বিচ্ছিন্নতা।

এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সেই ইতিহাসকে খোঁজা, যা কেবল নথিপত্রে নয়, মানুষের ভাঙা স্মৃতি, কথোপকথন, এবং পারিবারিক বয়ানে রয়ে গেছে। সেই স্মৃতিগুলি কখনও অস্পষ্ট, কখনও আবেগঘন, কিন্তু সবসময়ই ইতিহাসের এক অন্তঃসলিলা স্রোত, যা রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠের নিচে প্রবাহিত।

এইভাবে, "ভাগের রেখায় জীবন" কেবল একটি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা নয়, বরং একটি বৃহত্তর মানবিক অনুসন্ধান—যার কেন্দ্রে আছে মানুষের যন্ত্রণার ভাষা, বিচ্ছেদের মানচিত্র, এবং সেইসব কণ্ঠস্বর যাঁদের ইতিহাস কখনও গুনে দেখেনি, শোনেনি, বা গুরুত্ব দেয়নি। এঁদের আত্মকথনই তাই হয়ে ওঠে এক বিকল্প ঐতিহাসিক দলিল—যা মানবিকতা, স্মৃতিচর্চা এবং অনুভবের ভিত্তিতে রচিত।

১: সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে শরণার্থী বসতি ও জীবনযাত্রার প্রাথমিক রূপরেখা (১৯৪৭–১৯৬২)

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে সংঘটিত দেশভাগ ভারতীয় উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক অভিঘাত এনেছিল, তার অন্যতম প্রকাশ ঘটেছিল সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে শরণার্থী আগমনের মধ্য দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা মালদহ, যা তখন খান বাহাদুর আবু হায়াত বি. খান চৌধুরীর জমিদারির অংশ ছিল, দেশভাগ-পরবর্তী শরণার্থী পুনর্বাসনের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মালদহ জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বামনগোলা ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি—যেমন রাঙামাটিয়া, খুটাদহ, বটতলী, তালতলা, হরিপাল ও সোনঘাট—এই প্রক্রিয়ার সরাসরি অংশীদার হয়ে ওঠে।

এই গ্রামগুলি পুনর্ভবা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত এবং নদীটি এখানকার প্রাকৃতিক সীমারেখা হিসেবে ভারত ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) মধ্যে বিভাজন রচনা করে। দেশভাগের ঠিক আগে পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল জনবসতিহীন, ঘন জঙ্গল, জলাভূমি ও বন্যজীবজন্তুর অবাধ আশ্রয়স্থল। বসবাসের একেবারেই অযোগ্য বলে চিহ্নিত এই এলাকা হঠাৎ করেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত নিঃস্ব শরণার্থীদের কাছে। তাঁদের অধিকাংশই ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৯৪৭–৪৮ সালের মধ্যে এসেছিলেন। শরণার্থী শিবিরে সাময়িক আশ্রয়ের পর তাঁরা জীবিকা ও বাসস্থানের খোঁজে এই দুর্গম অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং জঙ্গল কেটে ধাপে ধাপে জনবসতি স্থাপন শুরু করেন।

প্রথম দিককার বসবাসকারী পরিবারের মধ্যে রাঙামাটিয়ার যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও তাঁর পরিবার, পঞ্চানন মণ্ডল,ফটিক মল্লিক,কেশবলাল বিশ্বাস ও তাঁর পরিবার,রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হরিচরণ বিশ্বাস, কেশব মণ্ডল, বটতলী গ্রামের মোড়ল লালচাঁদ বাড়ৈ এবং খুটাদহের ডাক্তার শরৎচন্দ্র সিকদার,রাজেন্দ্রনাথ রায় ও শশী বাড়ৈ, নন্দিনাদহের ভুবন সমাদ্দার,রাজেন্দ্রনাথ হালদার (জনদরদী অধ্যক্ষ নামে সুপরিচিত), রসিক সমাদ্দার, আনন্দ মজুমদার,ছিদাম মজুমদার,কার্তিক মন্ডল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পরিবারগুলিই প্রকৃতপক্ষে জীবনের চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও আশ্রয়স্থল হিসেবে এই অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন।

এই সময়ে খান বাহাদুর আবু হায়াত বি. খান চৌধুরীর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একজন জনদরদী জমিদার হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ১৯৫০-৫১ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির আইন কার্যকর হলে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর জমির বড় একটি অংশ—বিশেষত রাঙামাটিয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে—স্থানীয় গরিব কৃষকদের মধ্যে বিলি করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫২ সালে হাঁসপুকুরে স্থাপিত জমি বণ্টন ক্যাম্পের মাধ্যমে জমি বণ্টনের এই প্রক্রিয়ায় তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরী (পরবর্তীতে বরকত সাহেব নামে খ্যাত) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রতিটি পরিবারকে বাড়ির প্লট ও কৃষিকাজের জন্য বিশাল জমি প্রদান করা হয়, যার পরিমাণ ছিল গড়ে ১০ থেকে ৮০ বিঘা পর্যন্ত। এই জমি পেয়ে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজ শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে।

প্রথম প্রজন্মের বসবাসকারীরা শুধু নিজেদের বসতি স্থাপনেই ক্ষান্ত হননি, বরং পরবর্তীকালে তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের খবর দিয়ে এখানকার উর্বর জমির কথা জানালে ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই গ্রামগুলোতে আরও বহু শরণার্থী পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে

বসবাসকারীরা তাঁদের বাসস্থান, খাদ্য ও জমি ভাগ করে নিয়ে নতুন আগতদের পুনর্বাসনে সহায়তা করেন। এই পারস্পরিক সহমর্মিতা, জমির উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি এবং সামাজিক সম্প্রীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন সমাজ কাঠামো এক নতুন ধরণের 'গ্রামীণ মানবিকতাবাদ'-এর নিদর্শন হয়ে ওঠে।

বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সমাজ গঠনের যে চিত্র দেখা যায়, তা কেবল শরণার্থীদের মানসিক দৃঢ়তা ও পরিশ্রমের পরিচায়ক নয়, বরং প্রান্তিক অঞ্চলে শোষণমুক্ত, পরিশ্রমনির্ভর ও সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। জমিদার ও শরণার্থীদের মধ্যকার সহযোগিতামূলক সম্পর্ক এই সমাজ নির্মাণকে একটি মৌলিক রূপ দিয়েছে, যা ১৯৪৭-পরবর্তী শরণার্থী জীবনের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে গেছে।

(২) স্মৃতি ও মৌখিক ইতিহাস: আত্মকথনের নির্মাণ ও ন্যারেটিভ বিশ্লেষণ

ভারত বিভাগের মতো একটি ট্রমাজনিত ঘটনাকে বোঝার জন্য শুধুমাত্র সরকারি দলিল, পরিসংখ্যান কিংবা নীতিনির্ধারক বক্তব্য যথেষ্ট নয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাইরে একান্তভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি যেভাবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করে, তা অনেক সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে। মালদহ জেলার রাঙামাটিয়া, খুটাদহ, বটতলী, তালতলা, হরিপাল, সোনঘাট ও নন্দিনাদহ প্রভৃতি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে বসবাসকারী উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে যে কাহিনি প্রবাহিত হয়, তা শুধু অভিজ্ঞতার নয়, বরং একটি জাতীয় বিভাজনের আভ্যন্তরীণ অভ্যর্থনা।

এই অধ্যায়ে প্রধানত মৌখিক ইতিহাস ও আত্মকথনের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৭-র দেশভাগ পরবর্তী জীবন-নির্মাণের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মৌখিক ইতিহাস পদ্ধতির অনুগামী হিসেবে গবেষণাটি Pierre Nora-র 'Lieux de mémoire' বা স্মৃতির স্থান, এবং Alessandro Portelli-র মৌখিক ইতিহাস বিশ্লেষণের সূত্রে অনুপ্রাণিত।

২.১) স্মৃতির ভাষা ও আবেগগত বিন্যাস

স্থানীয় প্রবীণদের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের সময় দেখা গেছে, তাঁরা দেশভাগকে ব্যাখ্যা করেন মূলত "ছাড়তে বাধ্য হওয়া", "জায়গা খুঁজে না পাওয়া", "নতুন করে গড়ে ওঠা" এই কয়েকটি চিহ্নিত অনুভবের মধ্য দিয়ে। রাজেন্দ্রনাথ রায়, যিনি খুটাদহ গ্রামে প্রথম দালানবাড়ির মালিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, স্মৃতিচারণে তাঁর ছেলে বীরেন্দ্রনাথ রায় বলেন—
"বাবার মুখে শুনেছি আমরা যখন এসেছিলাম, একটাও মানুষ ছিল না এখানে... বন ছিল, সাপ ছিল, কিন্তু কোথাও যাওয়ার ছিল না। আমরা জমি কিনে নিইনি, জীবন কিনেছি..."

এই বক্তব্যে স্পষ্ট, উদ্বাস্তু হওয়া শুধুমাত্র ভৌগোলিক সীমানার পেরোনো নয়, বরং এক অনিশ্চিত অস্তিত্বের বিনিময়ে নিজের নতুন পরিচয় গঠনের কঠিন পথযাত্রা।

২.২) আত্মকথন ও ইতিহাসের অন্তর্বর্তী স্থান

এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের আত্মকথনে বারবার উঠে আসে ব্যক্তিগত বঞ্চনা, পরিশ্রম, ও প্রতিরোধের বয়ান। ফটিক মল্লিক ও তাঁর দত্তক সন্তান অমূল্য মল্লিকের গল্প এখানে একটি নিদর্শন—নিজেদের শিকড় থেকে ছিন্ন হয়ে আসা, সন্তানের অভাব থেকে অনাথ দত্তক নেওয়া, এবং একটি নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন। এই আত্মকথাগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস কেবল রাষ্ট্রনির্ধারিত ঘটনা নয়—বরং এটি ব্যক্তিগত সংগ্রাম, সংবেদন এবং জীবনের পুনর্নির্মাণের এক জৈবিক প্রক্রিয়া।

২.৩) মৌখিক ইতিহাসের রূপান্তরশীল চরিত্র

স্মৃতি এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়—তা সময়ের সঙ্গে বদলে যায়। যেমন রঞ্জিত ব্যাপারী বা হরিচরণ বিশ্বাসের পরিবার প্রথমে কেবল মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের বংশধররা নিজেদের "স্থায়ী অধিবাসী" হিসেবে পরিচিতি দিতে ভালোবাসেন। তাই এই মৌখিক ইতিহাস কখনওই নিছক সত্য-মিথ্যার কাঠামোতে বিশ্লেষণযোগ্য নয়; বরং এটি একটি 'প্রতিনিধিত্বমূলক সত্য'—যেখানে একটি জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত আত্মপরিচয় ও অস্তিত্বের রাজনীতি লুকিয়ে থাকে।

২.৪) প্রজন্মান্তরের স্মৃতিচর্চা ও বিস্মরণ

আধুনিক প্রজন্মের সঙ্গে কথোপকথনে দেখা গেছে, তাঁরা অতীতের দুঃখ, বাস্তুচ্যুতি কিংবা অভাবের কাহিনির সঙ্গে নিজেকে ততটা সংযুক্ত অনুভব করে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে।বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে দেশভাগের করুণ অনুভূতির জন্মই হয়নি।স্মৃতি এখন প্রায় এক নৈঃশব্দ্য—যা শুধুমাত্র উৎসব, পারিবারিক গল্প কিংবা পল্লীকথায় টিকে আছে। তবে কিছু পরিবারে দেখা যায় 'স্মৃতির শ্রাদ্ধ' অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের দুঃখকষ্টের গল্পকে স্মরণ করে এক ধরণের আত্মগর্ব জন্মায়—যা তাঁদের পরিচিতির একটি গর্বিত রূপ দেয়।

এই অধ্যায়ে দেখা গেল, আত্মকথন ও মৌখিক ইতিহাস Partition-পরবর্তী মানুষের জীবনের অমূল্য দলিল। এই কাহিনিগুলি শুধুমাত্র ইতিহাসের তথ্য নয়, বরং একেকটি 'স্মৃতি-গ্রন্থি'—যা মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভূমি ও জাতীয় পরিচয় নির্মাণের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। রাষ্ট্র যখন দলিল খোঁজে, তখন এই মানুষগুলো তাদের জীবনকেই দলিল হিসেবে তুলে ধরেন—একটি জীবন্ত ইতিহাস হিসেবে।

(৩) উদ্বাস্তু থেকে ভূমিপুত্র: সীমান্ত অঞ্চলে জমি, পরিশ্রম ও জীবনের পুনর্গঠন

দেশভাগের অভিঘাত মানুষের মননে, সমাজে, ও ভূখণ্ডে অজস্র ভাঙনের রেখা তৈরি করে দিয়েছিল। তবুও এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উদ্বাস্তু মানুষদের জীবন কেবল ক্ষতির ইতিহাস নয়; বরং তা এক প্রতিরোধ, নির্মাণ এবং পুনর্জন্মের আখ্যান। রাঙামাটিয়া, খুটাদহ, বটতলী, তালতলা, হরিপাল, নন্দিনাদহ ও সোনঘাট—এই গ্রামগুলো তারই উদাহরণ।

৩.১) ভূমিহীনতা থেকে ভূমির দাবি: জমির অধিকার ও উপহারের রাজনীতি

১৯৫০-এর দশকে যখন ভারতে জমিদারি প্রথা বিলোপ হয়, খান বাহাদুর আবু হায়াত বি. খান চৌধুরী একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নিজের জমির একটি বৃহৎ অংশ তিনি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলিয়ে দেন, যা ছিল তৎকালীন সামাজিক ন্যায়বিচারের এক প্রকার উদার আকার। ১৯৫২ সালে হাঁসপুকুর গ্রামে আয়োজিত জমি-বণ্টন ক্যাম্প ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যেখানে উদ্বাস্তু মানুষজন প্রথমবারের মতো নিজের নামে জমি লাভ করেন।
যেমন জানা যায়, কেউ ১০ বিঘা, কেউ কেউ ৩০ থেকে ৮০ বিঘা পর্যন্ত জমি পান। এই জমি তাঁদের কাছে শুধু জীবিকার উপায় নয়, বরং "নিজস্বতার" প্রথম স্বাদ। জমির মালিক হওয়ার এই যে অনুভূতি, তা এক ধরনের নাগরিক পরিচয় ও আত্মমর্যাদার জন্ম দেয়।

৩.২) জঙ্গল থেকে জনপদ: পরিশ্রমের রাজনীতি

এই অঞ্চলের শুরুর দিনগুলিতে বাস করাই ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। শিয়াল-সাপে ভর্তি জঙ্গল কেটে ঘর বানানো, জলাভূমি সেচ করে জমি চাষ করা, খাল থেকে মাছ ধরা—সবই ছিল এই জনপদের গঠন পর্বের অঙ্গ।গ্রামবাসী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূনর্ভবা নদী থেকে খাল কেটে বিস্তৃত চাষের জমিতে বর্ষাকালে বন্যার জল

প্রবেশের সুযোগ করে দিত।এই খালের মাধ্যমে এক সঙ্গে অনেক গুলো উদ্দেশ্য সাধিত হত।কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্ষায় সেই খাল দিয়ে প্রচুর মাছ বিলে প্রবেশ করত,পরবর্তীতে যা ধরে এক শ্রেণির মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতেন। এছাড়াও বর্ষায় পূনর্ভবায় প্রবাহিত অতিরিক্ত জলে এলাকার গ্রাম গুলিতে বন্যার প্রবণতা কমে যেত।এই খাল গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল--তালতলা খাল,হরিপাল ও সোনঘাটের সীমানা বরাবর হরিপাল খাল এবং রাঙ্গামাটিয়া ও নন্দিনাদহের সীমানা বরাবর নন্দিনাদহ খাল।এসব কেবল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন নয়, বরং পরিবেশের সঙ্গে একধরনের সহাবস্থান গড়ে তোলার প্রক্রিয়া।

এই অঞ্চলের কৃষিকাজ ও মাছ ধরার চর্চা শুধু খাদ্যের জোগান দেয়নি, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনের ভিত শক্ত করেছে। কৃষির সঙ্গে জড়িত সামূহিক পরিশ্রম, বিনা পারিশ্রমিকে পরস্পরের জমিতে কাজ করে দেওয়া(স্থানীয় ভাষায় একে 'বেগার' বলা হয়) এবং পারস্পরিক নির্ভরতার এক বিশেষ ধারা তৈরি করে দেয়—যা উদ্বাস্তু থেকে 'গ্রামবাসী' হয়ে ওঠার রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করে।

৩.৩) বসতি ও আত্মপরিচয়ের স্থায়িত্ব

জমি পাওয়ার পর উদ্বাস্তু পরিবারগুলো বাড়ি তৈরি করেন—মাটি ও খড়ের কুঁড়েঘর থেকে ধীরে ধীরে টিনের ঘর।তবে মাটিরঘর ও কুঁড়েঘর থেকে টিনের ঘরে পৌঁছাতে দীর্ঘ লড়াইয়ের এক ইতিহাস রয়েছে।রাজেন্দ্রনাথ রায়ের দালানবাড়ি ছিল এই পরিবর্তনের অন্যতম নিদর্শন। এই দালান শুধু অর্থবিত্তের চিহ্ন ছিল না, বরং একটি 'স্থায়ী ঠিকানা' হিসেবে এলাকায় আত্মপরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করত। ধীরে ধীরে গ্রামগুলির চরিত্র বদলাতে শুরু করে—জমির মালিকানা, নিয়মিত কৃষিকাজ, স্থায়ী বসতি, স্কুল গঠন, হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা—সবই এক নতুন সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণের অংশ হয়ে ওঠে।

৩.৪) নারী ও গৃহস্থালি: অদৃশ্য শ্রমের ভয়াল ইতিহাস

এই পুনর্গঠনের আখ্যানের পেছনে নারীর ভূমিকা প্রায় অদৃশ্য থেকেছে। অথচ প্রতিটি নতুন ঘরের উনুন জ্বালানো থেকে শুরু করে জমির চাষে সহায়তা, মাছ ধরা, ঘর নির্মাণ—সবকিছুতেই নারীরা ছিলেন অক্লান্ত অংশীদার। মৌখিক ইতিহাসে বারবার উঠে আসে—"মাটি কেটে উঠোন করেছি, বাঁশ কেটে ঘর করেছি, আর বাচ্চা পিঠে নিয়েই জমিতে গিয়েছি।" এই বক্তব্য গুলো তাঁদের অদৃশ্য শ্রমের বিপুলতাকে দৃশ্যমান করে।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে ছিন্নমূল মানুষজন একটি নতুন ভূখণ্ডে নিজেদের কায়িক শ্রম, পারস্পরিক সহানুভূতি, এবং জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন সমাজের নির্মাতা হয়ে উঠেছেন। এই সমাজে জমি কেবল জমি নয়—তা স্মৃতি, আত্মপরিচয়, গর্ব, এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

(৪) সমাজের ভিতর সমাজ: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম ও নেতৃত্বের বিকাশ

দেশভাগের অভিঘাতে উদ্বাস্তু মানুষদের জীবন কেবল ঘরবাড়ি ও জমি ঘিরে আবর্তিত হয়নি। তাঁদের প্রয়োজনে ও প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এক জটিল সমাজ কাঠামো, যার ভেতরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্মীয় রীতি ও স্থানীয় নেতৃত্ব এক অভিন্ন জীবনপ্রবাহের রূপ ধারণ করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সমাজের অন্তর্গত স্তরগুলিকে অন্বেষণ করব।

৪.১) শিক্ষার অক্ষরজ্ঞান: অন্ধকারে আলো জ্বালানোর চেষ্টা

দেশভাগের পরে আশ্রয় নেওয়া বহু পরিবারে শিশুদের শিক্ষাদানের কোনো সুযোগ ছিল না। অধিকাংশই ছিল নিম্নশ্রেণির কৃষক পরিবার, যাদের জীবন সংগ্রাম ছিল দৈনন্দিন খাদ্য সংস্থানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবু আশ্চর্যজনকভাবে, এই জীবনসংগ্রামের মধ্যেই শিক্ষার জন্য এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠে।

খুটাদহ গ্রামের রাজেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ, যিনি নিজের বাড়িকে কেন্দ্র করে প্রথমদিকে সন্ধ্যা বিদ্যালয়ের আয়োজন করেন। ধীরে ধীরে আশেপাশের গ্রামগুলোতেও কাঁচা ঘরে, চৌকি পেতে বা গাছতলায় শিশুদের পড়ানো শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে বেসরকারি অনুদান, স্থানীয় সহযোগিতা এবং সরকারের সহযোগিতায় একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি বিদ্যালয় গুলোতে কোনো ঘর ছিল না।হয় গাছ তলায় নতুবা কোনো সহৃদয় ব্যক্তির বাড়ির বারান্দায় এগুলোর সূচনা হয়েছিল।এই ভাবে সরকারি উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে ফ্রি প্রাইমারি বিদ্যালয় তৈরি হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই এলাকার পড়ুয়াদের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়।ওই সব গ্রামের কোথাও উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না।প্রায় পনেরো কিমি দূরে কুপাদহ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য যেতে হত।কাছাকাছি উচ্চ বিদ্যালয় না থাকার ফলে এলাকার বেশির ভাগ ছেলে মেয়েরা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে পড়াশুনাকে বিদায় জানাতেন।দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে খুটাদহ গ্রামে "খুটাদহ রাঙ্গামাটিয়া চন্দ্রবর উচ্চ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা হয়।এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারিগর রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের সুহৃদ 'চন্দ্রকান্ত বর', যিনি বিদ্যালয়ের জমি দান করেছিলেন।এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়, উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, চিন্তাশক্তি ও সামাজিক সংহতির বীজ বপন করে।

৪.২) স্বাস্থ্যব্যবস্থা: কোয়াক ডাক্তার,কবিরাজী ও ঘরোয়া চিকিৎসার নির্ভরতা

প্রাথমিক পর্যায়ে এই অঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসার কোনো পরিকাঠামো ছিল না। খালবিল-জঙ্গলে ঘেরা এলাকার জলবায়ু নানা ধরনের রোগবালাইয়ের জন্ম দিত। ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, সাপের কামড়, শিশুদের অপুষ্টি—এসব ছিল নিত্য সঙ্গী। এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন স্বশিক্ষিত ‘কোয়াক’ ডাক্তারই হয়ে ওঠেন গ্রামের ভরসা।

খুটাদহ গ্রামের ডাক্তার শরৎচন্দ্র সিকদার ও নন্দিনাদহ গ্রামের হরিদাস সমাদ্দার (পেশায় কোয়াক ডাক্তার) এই অঞ্চলে একমাত্র চিকিৎসা সহায়ক ব্যক্তি ছিলেন। প্রায়শই তাঁরা নামমাত্র মূল্যে ওষুধ দিতেন, কখনও দূরের শহরে রেফার করতেন, আবার সাপের কামড়ে ঝাড়ফুঁকের পাশাপাশি ঘরোয়া ওষুধও দিতেন। কবিরাজী চিকিৎসক হিসেবে পাশের ভুলকিমারী গ্রামের কর্ণ কবিরাজের যথেষ্ট সুনাম ছিল।ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতিতে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনিও চিকিৎসা করতে নামমাত্র ফিস নিতেন।তাঁদের প্রতি মানুষের যে আস্থা তৈরি হয়েছিল, তা শুধুমাত্র চিকিৎসা নয়, একধরনের সামাজিক সহানুভূতির ক্ষেত্রেও উদাহরণ।

৪.৩) ধর্ম ও সংস্কৃতি: পরিচয়ের পুণর্গঠন

প্রবল ধর্মীয় বৈষম্যের অভিজ্ঞতা নিয়েই এই উদ্বাস্তুরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নতুন সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ধর্ম ছিল বিভাজনের পরিবর্তে ঐক্যের ক্ষেত্র।

প্রতিটি গ্রামে গড়ে ওঠে এক বা একাধিক নামঘর, পূজামণ্ডপ, কালী বা শিবমন্দির। মহালয়া, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জন্মাষ্টমী, সরস্বতী পূজা ছিল গ্রামের সমগ্র সমাজের উৎসব, যেখানে

ধর্মীয় আচার কেবলমাত্র ঈশ্বর-ভক্তি নয়, বরং সমবেত জীবনযাপনের এক প্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি, কালীপূজা বা কীর্তন উপলক্ষ্যে রীতিমতো নাটক ও যাত্রা হতো, যেগুলিতে অংশ নিতেন গ্রামবাসী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে।

৪.৪) স্থানীয় নেতৃত্ব ও সামাজিক সংগঠন

উদ্বাস্তুদের মধ্যে থেকে উঠে আসা কিছু মানুষ সমাজের স্বাভাবিক নেতৃত্বে চলে আসেন। যেমন 'হালদার' নামে পরিচিত অধ্যক্ষ ব্যক্তি যিনি বরিশাল থেকে আসার পর এলাকায় নেতৃত্ব দেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সূচনা হওয়ার পর তাঁর মতো ব্যক্তিরা বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্বও গড়ে ওঠে—যেমন কেউ কেউ সালিশি সভার আয়োজক, কেউ আবার জমির সীমানা নির্ধারণে নিরপেক্ষ বিচারক।

এই সমস্ত নেতৃত্ব কেবল প্রশাসনিক নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক—তাঁদের কথা মানা হত কারণ তাঁরা জনগণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই ধরনের নেতৃত্বই এক অনানুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যেখানে গোষ্ঠীগত মতামত, পারস্পরিক সম্মান ও চর্চা একটি অভ্যন্তরীণ সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে।

এই অধ্যায়ে আমরা যে সমাজকে দেখলাম, তা একদম গোড়া থেকে গড়ে ওঠা। অন্ধকার, অনিশ্চয়তা, ও বঞ্চনার ভিতর থেকে উঠে আসা এক সমাজ—যেখানে শিক্ষার আলো, স্বাস্থ্যসেবার প্রাথমিক রূপরেখা, ধর্মীয় সংস্কৃতির ভিত্তি এবং স্থানীয় নেতৃত্ব মিলিয়ে একটি আত্মনির্ভর ও আত্মসম্মানী সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। উদ্বাস্তু মানুষদের দ্বারা গড়ে তোলা এই সমাজ কেবল পুনর্বাসনের নয়, বরং আত্ম-পরিচয় ও সামাজিক পুনর্জন্মের ইতিহাস।

(৫) স্মৃতির রেখাচিত্র: আত্মকথনে দেশভাগ ও মানসিক অভিঘাত

"ভাগ হওয়া মানে শুধু ভূখণ্ডের বিভাজন নয়, মানুষে মানুষে ফাটল"—এই কথাটি যেন দেশভাগ-পরবর্তী রাঙাঁমাটিয়া, খুটাদহ, বটতলী, তালতলা, হরিপাল, সোনঘাট, নন্দিনাদহ ও আশেপাশের গ্রামগুলির জীবনকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের মনে দেশভাগের অভিজ্ঞতা শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং এক আজীবন বহন করে চলা গভীর মানসিক ক্ষত। এই অধ্যায়ে সেই ক্ষতের বয়ান—মৌখিক স্মৃতি ও আত্মকথনের ভিত্তিতে তুলে ধরা হবে।

৫.১) স্মৃতির ভাঁজে দেশ: চলে আসার গল্প

বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে উঠে আসে, কীভাবে হঠাৎ একদিন ঘোষণা আসে—"এখানে আর থাকা যাবে না, আমাদের চলে যেতে হবে"। কেউ এলেন রাতের আঁধারে, কেউবা পুকুর পেরিয়ে, কেউ নদী সাঁতরে। নারায়ণ চন্দ্র মন্ডলের ছেলে অঞ্জন মন্ডল বলেছিলেন,

"আমি তখন খুব ছোট। বাবা বলেছিলেন—'এইখানেই জন্ম, কিন্তু এইখানে মৃত্যু হবে না।' খালি এক কাপড়, মা'র কোলে আমি, আর হাতে কিছু ধান-চাল।"

এই স্মৃতিগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝি—উদ্বাস্তু হওয়া মানে শুধু শারীরিক স্থানচ্যুতি নয়, মানসিকভাবে 'নিজ' বলতে যা বোঝায় তার বিচ্ছিন্নতা।

৫.২) উদ্বাস্তু থেকে স্থানবাসী: মানসিক দ্বন্দ্ব ও পুনর্জন্ম
যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মন জুড়ে ছিল ‘ফিরে যাবার’ এক আশাভরসা। অনেকেই মনে করতেন, এই দেশভাগ স্থায়ী নয়, কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরেই তাঁরা ফিরতে পারবেন পূর্ববঙ্গের নিজ বাড়িতে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল নির্মম। শিকড় কেটে আসা মানুষগুলোকে নতুন মাটিতে গড়ে তুলতে হয়েছে নতুন শিকড়।

এই মানসিক দ্বন্দ্বে দোল খেতে খেতে অনেকেই নিজেদের ভাষায় বলতেন,
“এই দেশেও আমরা আপন নই, ওদেশেও কেউ নেই। তাহলে আমরা কে?”
এই অনিশ্চয়তা ও অস্তিত্বের সংকট তাঁদের মধ্যে একধরনের বিষণ্নতা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল।

৫.৩) গল্পের গল্পে ইতিহাস: মৌখিক বয়ান ও আন্তর্জেনারেশন স্মৃতি
এই গ্রামগুলির প্রৌঢ় এবং প্রবীণ মানুষদের স্মৃতিতে আজও ভেসে আসে দেশভাগের দিনগুলো। বেশিরভাগই অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত হলেও তাঁদের বয়ানে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে।
ফটিক মল্লিকের দত্তকপুত্র অমূল্য মল্লিকের মতে,
“আমার বাবা বলতেন—ঘর মানে দেয়াল নয়, ঘর মানে বুকের ভেতর কিছু মানুষ। দেশভাগে আমরা শুধু দেয়াল হারাইনি, সেই মানুষগুলোও হারিয়ে ফেলেছি।”

এই মৌখিক ইতিহাস আজ শুধু তথ্যগত নয়, বরং আবেগ, বেদনা এবং টিকে থাকার এক অনন্য দলিল। তাঁদের সন্তান ও নাতি-নাতনিরাও এই গল্প শুনে বড় হয়েছে। ফলে স্মৃতি এখানে কেবল ব্যক্তিগত নয়, আন্তঃপ্রজন্মের উত্তরাধিকারের অংশ।

৫.৪) ব্যথা থেকে বাঁচার ভাষা: ধর্ম, গান, উৎসব ও নিঃশব্দতা
বিভিন্ন স্মৃতিকথায় দেখা যায়, দেশভাগের বেদনা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ ধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন—কেউ কালীপুজোয় নিঃশব্দে প্রার্থনা করেছেন, কেউবা একতারা হাতে বাউলগান গেয়ে নিজের যন্ত্রণাকে সুরে রূপ দিয়েছেন।
আরও একটি দিক লক্ষণীয়—এই বয়ানগুলিতে অনেক সময় সম্পূর্ণ নীরবতা বা অব্যক্তির উপস্থিতি। এমন অনেক কিছু তাঁরা বলেন না, যা মনে করেন বোঝানো সম্ভব নয়, বা বললেই আবার বেদনা ফিরে আসবে। এই ‘নীরবতা’ও একধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা, যেটি মৌখিক ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র স্বর।
এই অধ্যায়ের আলোচনায় স্পষ্ট হয়, ইতিহাস শুধু দলিল-দস্তাবেজের নয়, মানুষের স্মৃতির রেখায়ও গাঁথা। মৌখিক বয়ান ও আত্মকথন আমাদের একাধিক স্তরে দেশভাগের অভিঘাত বুঝতে সাহায্য করে—শরীর, মন, আত্মপরিচয় এবং সংস্কৃতির স্তরে। উদ্বাস্তু মানুষগুলোর স্মৃতি কেবল অতীতের নয়, বরং বর্তমানের গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ। এই স্মৃতিগুলিকে গুরুত্ব না দিলে দেশভাগ শুধু একটি রাজনৈতিক রূপরেখা হয়ে থাকবে; তার ভেতরের মানুষ, যন্ত্রণার স্তর এবং জীবনের নির্মাণ হারিয়ে যাবে।

(৬) আর্থসামাজিক সংগ্রাম ও জমির পুনর্বিন্যাস: উদ্বাস্তু জীবনের পুনর্গঠন
১৯৪৭-এর দেশভাগের অভিঘাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে প্রবেশ করে এক অজানা অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হন। মালদহ জেলার রাঙামাটিয়া, খুটাদহ, তালতলা, বটতলী, হরিপাল, সোনঘাট ও নন্দিনাদহ গ্রামগুলি তখন জনমানবহীন, ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং বসবাসের অযোগ্য বলে বিবেচিত ছিল। তবু

উদ্বাস্তুদের সামনে কোনও বিকল্প ছিল না। জীবনের তাগিদেই তাঁরা এই অনুর্বর জমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৬.১) জমি কেটে বেঁচে থাকার সংগ্রাম

প্রথম পর্যায়ে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পুনর্ভবা নদী ও খালবিল ঘেরা এলাকাগুলোতে জঙ্গল কেটে বসবাস শুরু করেন। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা যেমন সাপ, বন্য জন্তু ও জলজমি—তাঁদের জীবনযাত্রাকে চরম অনিশ্চয়তায় ফেলেছিল। তাঁরা গাছের ডালপালা, বাঁশ, খড় ও মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘর বানিয়ে প্রাথমিক আবাস গড়ে তোলে। কোনো রকম সরকারি সহায়তা না থাকা সত্ত্বেও, এঁরা নিজেদের পরিশ্রমের মাধ্যমে বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করেন।তবে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে পরিবার পিছু পরিমাণ মতো চাল,ডাল ও গম দেওয়া হত।একে বলা হত জি. আর.।

৬.২) জমিদারি বিলোপ ও জমির দান

১৯৫০-৫১ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপের পর খান বাহাদুর আবু হায়াত বি. খান চৌধুরী তাঁর বিশাল জমিদারির বড় অংশ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দান করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫২ সালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরী (পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা) হাঁসপুকুর গ্রামে একটি জমি বণ্টন ক্যাম্পের আয়োজন করেন। এই ক্যাম্পে বিভিন্ন উদ্বাস্তু পরিবারকে ১০ থেকে ৮০ বিঘা পর্যন্ত জমি প্রদান করা হয়।
এই ঘটনাটি এই অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ যে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র জনদরদী পদক্ষেপ, যা শুধুমাত্র প্রশাসনিক নির্দেশ নয়, মানবিক বোধের অনুরণনে গৃহীত হয়েছিল। এই জমির উপরই উদ্বাস্তু পরিবারগুলি কৃষিকাজ শুরু করেন।

৬.৩) সামাজিক সহমর্মিতা ও যৌথ উদ্যম

এইসময় স্থানীয় কিছু পরিবার এবং আগে থেকে বসতি গড়া উদ্বাস্তুরা নতুন আগতদের স্বাগত জানায়। প্রায়শই দেখা যায়—কেউ কারও বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন, কেউ খাবার ভাগ করে খেয়েছেন, আবার কেউ চাষের জমিতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। এই সহযোগিতা উদ্বাস্তু সমাজে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে।
সামাজিক সহযোগিতার এই চিত্রটি প্রমাণ করে—প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষ মানবতার হাত বাড়িয়ে দিতে জানে।বসবাসের জন্য এইসব উদ্বাস্তু পরিবার শুধু জমি পায়নি, পেয়েছে নতুন করে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ।

৬.৪) শ্রমের পুনর্মূল্যায়ন ও কৃষি উৎপাদন

উদ্বাস্তুদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জঙ্গল পরিণত হয় কৃষি-ভূমিতে। তাঁরা প্রথমে অল্প পরিমাণে ধান, আলু, পাট চাষ শুরু করেন এবং পরে শাকসবজি, সর্ষে, গম, ও নানা রকম ডাল উৎপাদন করতে সক্ষম হন। ধীরে ধীরে এইসব গ্রাম 'সোনার ফসল' উৎপাদনের জন্য পরিচিত হয়ে ওঠে।

এই ফসল উৎপাদনের সাফল্য উদ্বাস্তু সমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করে। কৃষিকাজের মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বের পরিচয় নিশ্চিত করেন।
এই অধ্যায়ে শেষে বলা যায়—উদ্বাস্তু জীবনের মূল ভিত্তি ছিল পরিশ্রম, পারস্পরিক সহযোগিতা, আর মানবিক সহানুভূতির সৌন্দর্য। জমিদার পরিবারের স্বতঃস্ফূর্ত জমিদান এই অঞ্চলের কৃষি ও জনবসতির ইতিহাসে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত রচনা করে।

উপসংহার (Conclusion) :

১৯৪৭ সালের দেশভাগ শুধু একটি রাজনৈতিক ঘটনার ইতিহাস নয়, বরং তা ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের এক গভীর ট্র্যাজেডি। এই গবেষণাপত্র “ভাগের রেখায় জীবন: ১৯৪৭-এর অভিজ্ঞতায় মানুষের আত্মকথন” তারই একটি আঞ্চলিক, মানবিক, এবং আত্মনিবেদিত পাঠ, যেখানে ইতিহাসের মূল স্রোতে উপেক্ষিত প্রান্তিক মানুষদের জীবন, ভাষ্য ও সংগ্রাম স্থান পেয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে কিভাবে মালদহ জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল—বিশেষত রাঙামাটিয়া, খুটাদহ, বটতলী, তালতলা, হরিপাল, সোনঘাট, নন্দিনাদহ ও আশপাশের অঞ্চলগুলো দেশভাগের অভিঘাতে পরিণত হয় এক ঐতিহাসিক অভিবাসনের কেন্দ্রে।

এই সমস্ত গ্রাম ১৯৪৭ সালের পূর্বে ছিল জনশূন্য, অরণ্যবেষ্টিত এবং বসবাসের অনুপযুক্ত। কিন্তু দেশভাগের ভয়াবহ বাস্তবতা যেসব হিন্দু পরিবারকে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছিল, তাঁদের কাছে এই জনমানবহীন অঞ্চল ছিল আশ্রয়ের শেষ ঠিকানা। যারা এসেছিলেন, তাদের অনেকের সাথেই ছিল না খাবার, টাকা, বা মাথা গোঁজার ঠাঁই—ছিল কেবল বেঁচে থাকার দুর্বার ইচ্ছাশক্তি। এইসব মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করে, খালবিল ভরাট করে, প্রাণ হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন বসবাসযোগ্য জনপদ।

গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে, এই অঞ্চলের জমিদার খান বাহাদুর আবু হায়াত বি. খান চৌধুরী ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরীর উদারতা ও মানবিক ভূমিকা—যেখানে তাঁরা সরকারি জমিদারি বিলোপের আগেই স্বেচ্ছায় বিস্তীর্ণ জমি দান করেছেন শরণার্থী কৃষকদের মধ্যে। এটি শুধু জমির বণ্টন নয়, বরং একটি মানবিক দৃষ্টান্ত, যা পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের ভিত্তি স্থাপন করে।

এই গবেষণার একটি মূল আকর্ষণ হল মৌখিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ, যা স্থানীয় অধিবাসীদের স্মৃতিভিত্তিক বয়ান থেকে সংগৃহীত। তাঁদের মুখে মুখে রক্ষিত ইতিহাস—যা কোনো সরকারি দলিলে নেই—এই গবেষণাকে জীবন্ত করে তুলেছে। এসব আত্মকথন শুধুই ব্যক্তিগত বেদনার অনুরণন নয়, বরং একটি জাতির বিভক্তি ও পুনর্গঠনের শ্রাব্য দলিল।

এই গবেষণা শুধুই অতীতের দিকে ফিরে তাকানোর নয়, বরং তা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও এক প্রাসঙ্গিক পাঠ। এই আত্মকথনগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই কীভাবে মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যেও নতুন জীবন গড়ে তোলে, নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই লেখে। স্থানচ্যুতি, পরিচয়-সংকট, সীমান্তের রাজনীতি—এই সমস্ত কিছুর প্রেক্ষিতে এই গবেষণা এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিল হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বোপরি, এই গবেষণাপত্র একটি নিরলস প্রচেষ্টা, যা একটি ছোট সীমান্ত অঞ্চলের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগ-পরবর্তী মানবিক সংকট ও তার উত্তরণের কাহিনি তুলে ধরেছে। এই কাজ ভবিষ্যতে দেশভাগ বিষয়ক আরও গবেষণাকে সমৃদ্ধ করবে এবং প্রান্তিক কণ্ঠস্বরগুলিকে ইতিহাসের মূলস্রোতে আনার কাজে সহায়ক হবে।

** **গবেষণার প্রধান অনুসন্ধান**

১. সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির রূপান্তর উদ্বাস্তুদের পরিশ্রম ও সহমর্মিতার ফল।
২. মৌখিক বয়ানের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে।
৩. জমিদার পরিবার বিশেষ করে খান বাহাদুর আবু হায়াত ও বরকত সাহেব পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন।

৪. উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পদ ভাগাভাগির এক দৃষ্টান্তমূলক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

** **গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ফাঁকফোকর**

১. অধিকাংশ তথ্য মৌখিক বয়ানের ওপর নির্ভরশীল, যেগুলির প্রমান্যতা যাচাই কঠিন।
২. মহিলাদের অভিজ্ঞতা এই গবেষণায় সীমিতভাবে এসেছে।
৩. প্রাতিষ্ঠানিক দলিল বা সরকারি রিপোর্টের অভাব অনুভূত হয়েছে।
৪. পরিবেশগত রূপান্তরের যথাযথ পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

** **ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র (Further Research)**
এই গবেষণাপত্র মূলত মালদহ জেলার সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামের প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ-উত্তর শরণার্থী অভিজ্ঞতা ও বসতি স্থাপনের মানবিক ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরভাবে গবেষণার একাধিক সম্ভাবনা রয়ে গেছে, যেমন—

1. নারীর অভিজ্ঞতা: দেশভাগের সময় নারী-জীবনের ওপর যে বৈশ্বিক পরিবর্তন এসেছিল, তার কোনও বিস্তারিত আত্মকথন এই গবেষণায় পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে নারীদের স্মৃতিকথা ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হতে পারে।

2. সাংস্কৃতিক রূপান্তর: পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মানুষদের সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন কিভাবে ঘটেছিল, এবং তাঁদের ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে—এই দিকটি আরও বিশ্লেষণযোগ্য।

3. উত্তরপ্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি: বর্তমানে বসবাসকারী উত্তরাধিকারীরা দেশভাগ ও পুনর্বাসন নিয়ে কী ভাবেন, তাঁদের চেতনার ভেতরে ইতিহাসের কী প্রভাব পড়েছে, তা নিয়েও গবেষণা করা যেতে পারে।

4. সীমান্ত রাজনীতির প্রভাব: দেশভাগের পরবর্তী দশকগুলিতে সীমান্তনীতি, নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ ও আধুনিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ভূমিকার ফলে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনধারায় যে পরিবর্তন এসেছে, তা বিশ্লেষণ করা গবেষণায় যুক্ত হতে পারে।

5. অধিক মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ: আরও বৃহৎ পরিসরে মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ করে এই গবেষণার পরিধিকে বিস্তৃত করা যেতে পারে যাতে আরও প্রামাণ্য ও বৈচিত্র্যময় তথ্য উঠে আসবে।

পরিশিষ্ট

A. গ্রামভিত্তিক উল্লেখযোগ্য উদ্বাস্তু পরিবারসমূহ (১৯৪৮-১৯৫২)

পরিশিষ্ট ১:সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ

নাম	আগত স্থান	বর্তমান বসতি	ভূমি প্রাপ্তি(বিঘা	পেশা	নির্বাচিত উক্তি
যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল ও নারায়ণ মন্ডল	ফরিদপুর	রাঙ্গামাটিয়া	৫০	কৃষিকাজ	যোগেন্দ্রনাথের নাতি সুমন্ত মন্ডলের কথায় "দাদুর কাছে শুনেছি জঙ্গলের ভিতর গাছ কেটে চাষবাস শুরু করেছিলেন।"
হরিচরণ বিশ্বাস, রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও কানাইলাল বিশ্বাস।	ফরিদপুর	রাঙ্গামাটিয়া	৫০	কৃষিকাজ	রাজেন্দ্রনাথের ছেলে রসময় বিশ্বাসের মতে "বাবার মুখে শুনেছি রায় বাবুর দয়ায় আমরা এখানে ঠাঁই পেয়েছিলাম□"
শশীভূষণ বাড়ৈ ও বলাইনাথ বাড়ৈ	ফরিদপুর	খুটাদহ	প্রায় ২০ বিঘা	কৃষিকাজ	শশীভূষণের বড় ছেলে স্বপন বাড়ৈ-এর কথায় "এখানে এসে প্রথমদিকে আমাদের খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হয়েছে।"
রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কেশবলাল বিশ্বাস ও অনিল বিশ্বাস	ফরিদপুর	রাঙ্গামাটিয়া	প্রায় ৪০	কৃষিকাজ ও গায়ক	কেশবলাল বিশ্বাসের বড় ছেলে কৃপাসিন্দু বিশ্বাসের কথায় "বাবার মুখে শুনেছি প্রথমাবস্থায় এই এলাকা মানুষের বসবাসের অযোগ্য ছিল□"
রসিক সমাদ্দার ও কালী সমাদ্দার	বরিশাল	নন্দিনাদহ	৬০	কৃষিকাজ	কালি সমাদ্দারের ছেলে পরিমল সমাদ্দার বললেন "দাদুর কাছে শুনেছি প্রথমাবস্থায় চরম অভাবে একবেলা খেয়ে

					কোনোক্রমে বেঁচে থেকেছেন।
রঞ্জিত বেপারী	বরিশাল	নন্দিনাদহ	৪০	কৃষিকাজ ও সমাজসেবা	রঞ্জিত ব্যাপারীর ছেলে দীপু জানালেন “বাবার মুখে শুনেছি এখানে এসে অমানুষিক পরিশ্রম করে দুবেলা পেটের ভাত জোগাড় করতে হয়েছে□“
ভুবন সমাদ্দার ও হরিদাস সমাদ্দার	বরিশাল	নন্দিনাদহ	৮০	কৃষিকাজ ও কোয়াক ডাক্তার	হরিদাসের ছেলে কল্যাণ সমাদ্দার জানালেন “প্রথম থেকেই এই এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় আমার উদারমনা বাবা নামমাত্র ফিস-এ এলাকাবাসীর চিকিৎসা করেছেন।
ফটিক মল্লিক ও অমূল্য মল্লিক	ফরিদপুর	রাঙ্গামাটিয়া	৬০	কৃষিকাজ	অমূল্য মল্লিকের কথায় “মাটি আমাদের আপন করে নিয়েছে□“
রাজেন্দ্রনাথ রায় (সর্বজনমান্য -শিক্ষিত রাজেনবাবু নামে সুপরিচিত)	ফরিদপুর	খুটাদহ	৯০	কৃষিকাজ ও জনদরদী সমাজসেবক	রাজেন বাবুর ছেলে, বীরেন্দ্রনাথ রায়ের কথায় “বাবাকে দেখেছি অসহায় এলাকাবাসীর যেকোনো অসুবিধায় তাঁদের পাশে দাঁড়াতেন□“
রাজেন্দ্রনাথ হালদার (অধ্যক্ষ নামে সুপরিচিত।)	বরিশাল	নন্দিনাদহ	৫০	কৃষিকাজ ও জনদরদী সমাজসেবক	অধ্যক্ষের ছেলে সুভাষ হালদারের কথায় “ছোটবেলা থেকেই দেখেছি এলাকাবাসীর যেকোনো সমস্যায় অসুবিধায় বাবাকে

					তাঁদের পাশে দাঁড়াতে□“
ছিদাম মজুমদার	বরিশাল	নন্দিনাদহ	৭০	কৃষিকাজ	ছিদামের ছেলে নন্দ মজুমদারের জানালেন “জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছি বাবা দিনরাত পরিশ্রম করে আমাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করেছেন”□
লালচাঁদ বাড়ৈ(মোড়ল নামে সুপরিচিত)	ফরিদপুর	বটতলী	৫০	কৃষিকাজ ও সমাজসেবা	ছেলে অরবিন্দ বাড়ৈ-এর বক্তব্য অনুযায়ী “বাবা-মায়ের মুখে শুনেছি একপ্রকার জীবন হাতে নিয়েই জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে লড়াই করে এখানে বসবাস করেছেন।“
বিনোদ মন্ডল	খুলনা	তালতলা	২৫	শিক্ষকতা (সোনঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)	বিনোদ বাবুর ছেলে জিতেনের কথায় “এই গ্রামে আমাদের বাড়ির আগে কোনো বসতি ছিল না□ জল, জঙ্গল, বন্য প্রাণীর সঙ্গে আমরা বসবাস করেছি।“
বিজয় কৃষ্ণ বিশ্বাস	ফরিদপুর	রাঙ্গামাটিয়া	০(শূন্য)	কৃষিকাজ ও ব্যবসা	বিজয় কৃষ্ণ বিশ্বাসের বড় ছেলে অমল কুমার বিশ্বাসের কথায় “এখানে আসার পর প্রথমাবস্থায় আমাদের থাকার জায়গা ছিল না□বাবা-মায়ের হাতে কোনো টাকা পয়সা ছিল না□আমরা এক

					সহৃদয় আত্মীয়ের আশ্রয়স্থলে ছিলাম।"

পরিশিষ্ট ২ : ভূমি বিতরণ কার্যক্রম

সাল	কার্যক্রম	স্থান	ফলাফল
১৯৫২	জমি বিতরণ ক্যাম্প	হাঁসপুকুর	পরিবার পিছু ১০-৮০ বিঘা জমি প্রদান।
১৯৫২-১৯৬২	আগত আত্মীয় পরিজনের পুনর্বাসন	রাঙ্গামাটিয়া, খুটাদহ,বটতলী, নন্দিনাদহ,হরিপাল, তালতলা ও সোনঘাট।	গ্রাম গঠিত ও কৃষি নির্ভর সমাজ

C. গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস

- মৌখিক ইতিহাস: ১২ জন প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার (গ্রাম: রাঙামাটিয়া, খুটাদহ, তালতলা, হরিপাল, সোনঘাট)।
- মাঠসমীক্ষা: জানুয়ারি–মার্চ ২০২৫।
- প্রাথমিক উৎস: পারিবারিক কাহিনি, মৌখিক স্মৃতি, স্থানিক ইতিহাস।
- গৌণ উৎস: সরকারি দলিল, ইতিহাস গ্রন্থ, পূর্ববর্তী গবেষণা।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

1. Bandyopadhyay, Sekhar. From Plassey to Partition: A History of Modern India. Orient BlackSwan, 2004.
2. Butalia, Urvashi. The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India. Duke University Press, 2000.
3. Chatterji, Joya. The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947–1967. Cambridge University Press, 2007.
4. Datta, Pradip Kumar. Carving Blocs: Communal Ideology in Early Twentieth-Century Bengal. Oxford University Press, 1999.
5. Ghosh, Partha S. The Politics of Personal Law in South Asia: Identity, Nationalism and the Uniform Civil Code. Routledge India, 2007.
6. Khan, Abu Barkat Ataur Ghani. মালদহের ইতিহাস ও আমার জীবন। ব্যক্তিগত সংগ্রহ (অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা)।

7. Oral (মৌখিক) Narratives collected from:

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল পরিবার, রাঙামাটিয়া গ্রাম; রাজেন্দ্রনাথ রায় পরিবার, খুটাদহ গ্রাম;
হরিদাস সমাদ্দার পরিবার, নন্দিনাদহ গ্রাম; ফটিক মল্লিকের দত্তক সন্তান অমূল্য মল্লিক

(গ্রামভিত্তিক মৌখিক ইতিহাসের সাক্ষাৎকার, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে গৃহীত)
8. Raychaudhuri, Tapan. Perceptions, Emotions, Sensibilities: Essays on India's Colonial and Post-Colonial Experiences. Oxford University Press, 2005.
9. West Bengal District Gazetteers: Malda. Government of West Bengal, 1969.

10. "The Abolition of Zamindari System in India." Parliamentary Debates, Lok Sabha Archives, 1950-51.
11. আকতারুজ্জামান ইলিয়াস। চিলেকোঠার সেপাই। মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৭।
— দেশভাগের মানসিক অভিঘাত ও ঢাকা-পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক চেতনা বিষয়ে উপন্যাসের মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ আলোকপাত।
12. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ভাগের ইতিহাস: স্মৃতি ও বাস্তবতা। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।
— দেশভাগকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুর জীবন ও অভিজ্ঞতার ভাষ্য।
13. সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গে উদ্বাস্তু বসতি: রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা। দেশকাল, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ৩২–৪৫।
— বিশেষ করে মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ির উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখা তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ।
14. সুমিতা চক্রবর্তী। দেশভাগ: মহিলাদের মুখে মুখে শোনা কথা। পরিচয় পত্রিকা, ১৯৯৭, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৪।
— মহিলাদের আত্মকথনে দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবনের অভিজ্ঞতা।
15. গোপাল হালদার। পূর্ববাংলার দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা: মালদহ জেলার প্রেক্ষিতে। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, ২০০১।
—এলাকাভিত্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্যনির্ভর গ্রন্থ।
16. আশিস নন্দী (সম্পাদিত)। ভাগের মনস্কতা। দে’জ পাবলিশিং, ২০০৫।
— দেশভাগ সংক্রান্ত স্মৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে ফারাক তুলে ধরে।
17. অরুন্ধতী রায়। গণতন্ত্রের জাদুকরী রাজনীতি ও উদ্বাস্তু বাস্তবতা। বর্তমান চিন্তা, জানুয়ারি ২০০৭।
— নেহরু নীতির আলোকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন।
18. মালদহ জেলা বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৫০–৫৫)। জেলা প্রশাসক দপ্তর, মালদহ।
— সরকারি পুনর্বাসন নীতির মূল্যবান নথি।
19. প্রতিমা বসু। আত্মজীবনী: আমি ও আমার সময়। সাহিত্য সংসদ, ১৯৮০।
— দেশভাগকালীন উদ্বাস্তু অভিজ্ঞতার লেখিকার নিজস্ব ভাষ্য।
20. ক্ষেত্রসমীক্ষা